পতিত হবে। (সেমতে কিছুদিন পরেই তারা নিহত ও বন্দী হয়েছে। মুনাফিকদের সারা জীবন আক্ষেপ ও পরিতাপের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। কারণ, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল)। এবং (পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখবেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। এটা খুবই মন্দ ঠিকানা। (অতঃপর এই শাস্তির এ বলে আরো দৃঢ় করা হচ্ছে যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী (অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমান। ইচ্ছা করলে যে কোন একটি বাহিনী দ্বারা সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন। কারণ তারা এরই উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তিনি) প্রজ্ঞাময় (তাই উপযোগিতার কারণে শাস্তিদানের ব্যাপারে অবকাশ দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এসব নিয়ামত তো আপনার জন্য। এগুলো আপনার জন্য মোবারক হোক; কিন্তু আমাদের জন্য কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত যেহেতু ঈমান ও রসূল (সা)-এর আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলো সব মু'মিনও শামিল। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সেই এসব নিয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ۝٨ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ۝٩ إِنَّ
الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ
فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ
عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٠

(৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ্র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে, অতি অবশ্যই সে তা

নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ্ সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ!) আমি আপনাকে (কিয়ামতের দিন উম্মতের ক্রিয়াকর্মের) সাক্ষ্য-দাতা রূপে (সাধারণত) এবং (দুনিয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে) সুসংবাদদাতা রূপে এবং (কাফিরদেরকে) ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি, (হে মুসলমানগণ! আমি তাঁকে এ কারণে রসূল করে প্রেরণ করেছি) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে (ধর্মের কাজে) সাহায্য ও সম্মান কর (বিশ্বাসগতভাবেও অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করে এবং কার্য-গতভাবেও অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করে)। এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণার তফসীর নামায হলে সকাল-সন্ধ্যার ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। নতুবা সাধারণ যিকর যদিও তা মুস্তাহাব হয়—বোঝানো হয়েছে। অতঃপর কতিপয় বিশেষ হক সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছেঃ) যারা আপনার কাছে (হুদায়বিয়ার দিবসে এ বিষয়ে) শপথ করছে (অর্থাৎ অঙ্গীকার করেছে) যে, জিহাদ থেকে পলায়ন করবে না, তারা বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শপথ করছে। (কেননা, উদ্দেশ্য আপনার কাছে এ বিষয়ে শপথ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান তারা প্রতিপালন করবে। অতএব যেন) আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর (শপথ করার পর) যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে (অর্থাৎ আনুগত্যের পরিবর্তে বিরুদ্ধাচরণ করবে), তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তার উপরই বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সত্বরই আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বায়'আতে রিয-ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নিয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ্ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা)। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের হক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ شاهد, مبشر و نذير

شاهد শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নিসার فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا আয়াতের তফসীরে দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহ্র পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে

এবং কেউ নাফরমানী করেছে। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। সূরা নিসার আয়াতের তফসীরে কুরতুবী লিখেন ঃ পয়গম্বরগণের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবূল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাক্ষ্য তাঁর আমলের লোক-দের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপ কাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।—(কুরতুবী)

بشير শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং نذير শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতের আনুগত্যশীল মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন এবং কাফির পাপাচারীদেরকে আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরও তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিধেয়—

تُعَزِّرُوْهُ—تُوَقِّرُوْهُ এবং تُسَبِّحُوْهُ

تُعَزِّرُوْهُ—শব্দটি تعزير ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تعزير বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়।
---(মুফরাদাতুল-কোরআন)

تُوَقِّرُوْهُ—শব্দটি توقير ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সম্মান করা। تُسَبِّحُوْهُ শব্দটি تسبيح ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিত-রূপে আল্লাহ্র জন্যই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝা-নোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহ্কেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে অর্থাৎ তাঁর দীনকে ও রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে পড়ে, যা অলংকার-শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়'আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহ্র হাতে বায়'আত করেছে। কারণ, এই বায়'আতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসূলের হাতে হাত রেখে বায়-'আত করল, তখন যেন আল্লাহ্র হাতেই বায়'আত করল। আল্লাহ্র হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দুরস্ত নয়।

বায়'আতের আসল শর্ত কোন বিশেষ কাজের জন্য শপথ গ্রহণ করা। একজন অপর-জনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বায়'আতের প্রাচীন ও মসনূন তরীকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। যে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনত ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়'আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ্ ও রসূলের কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ قُلْ
فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ
بِكُمْ نَفْعًا ۭ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ⑪ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ
لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ
فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ⑫
وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ⑬
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑭

(১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে ঃ আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মু'মিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্য খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব

কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব মরুবাসী (হুদায়বিয়া সফর থেকে) পশ্চাতে রয়ে গেছে, (সফরে শরীক হয়নি) তারা সত্বরই (যখন আপনি মদীনায় পৌঁছবেন) আপনাকে (মিছামিছি) বলবে (আমরা আপনার সাথে যাইনি কারণ) আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য (এই ত্রুটি) মার্জনার দোয়া করুন। (এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে বলেন ঃ) তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যখন আপনার কাছে এই ওযর পেশ করে, তখন] আপনি বলে দিন (প্রথমত এই ওযর সত্য হলেও আল্লাহ্ ও রসূলের অকাট্য নির্দেশের মুকাবিলায় তুচ্ছ ও বাতিল গণ্য হত। কেননা, আমি জিজ্ঞাসা করি,) আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার করার ইচ্ছা করলে কে তাঁর সামনে তোমাদের জন্য (উপকার ক্ষতি ইত্যাদি) কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে? (অর্থাৎ তোমাদের সত্তা অথবা তোমাদের ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে উপকার অথবা ক্ষতি তকদীরে অবধারিত হয়ে গেছে, তার খেলাফ করার ক্ষমতা কারও নেই। তবে শরীয়ত অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের আশংকার ওযর কবূল করে অনুমতি দিয়েছে, যদি সেই ওযর বাস্তবে সত্য হয়। আলোচ্য প্রশ্নে শরীয়ত বাড়ী-ঘরের ব্যস্ততাকে গ্রহণযোগ্য ওযর সাব্যস্ত করেনি যদিও তা বাস্তবসম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, তোমাদের পেশকৃত এই ওযর সত্যও নয়। তোমরা মনে কর যে, আমি এই মিথ্যা সম্পর্কে অবগত নই, কিন্তু সত্য এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি) তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত (তিনি আমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেছেন যে, তোমাদের অনুপস্থিতির কারণ তা নয়, যা তোমরা বর্ণনা করছ) বরং (আসল কারণ এই যে,) তোমরা মনে করেছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ কখনও তাঁদের বাড়ী-ঘরে ফিরে আসতে পারবেন না (মুশরিকদের হাতে সবাই প্রাণ হারাবে) এবং এই ধারণা তোমাদের মনেও খুব সুখকর ছিল (আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি শত্রুতার কারণে এটা তোমাদের আন্তরিক কামনাও ছিল)। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা (এসব কুফরী ধারণার কারণে) এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায় ছিলে। (এসব শাস্তির খবর শুনে তোমরা এখনও ঈমানদার হয়ে গেলে ভাল, নতুবা) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (মু'মিন ও অবিশ্বাসীদের জন্য এই আইন রচনার কারণে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। (কাফির যদিও শাস্তির যোগ্য হয়, কিন্তু) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (কাজেই সেও খাঁটি মনে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকেও ক্ষমা করে দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)

হুদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা নানা তালবাহানার আশ্রয় নেয়। হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশে একথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাঁটি ঈমানদার হয়ে যায়।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا
نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا
كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ
كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ
إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا
يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

(১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্র কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন ঃ তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বুঝে। (১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন ঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (১৭) অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য ও রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা সত্বরই যখন (খায়বরের) যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা (হুদায়বিয়ার সফর থেকে) পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যাবার অনুমতি দাও। (এই আবেদনের কারণ ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করা। লক্ষণাদি দৃষ্টে এই সম্পদ লাভের বিষয় তাদের জানা ছিল এবং তারা তা প্রত্যাশাও করত। কিন্তু হুদায়বিয়ার সফরে কষ্ট ও ধ্বংসই অধিক প্রত্যাশিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ) তারা আল্লাহ্র আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। (অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ছিল এই যে, এই যুদ্ধে তারাই যাবে, যারা হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের ব্যতীত অন্য কেউ যাবে না ; বিশেষত তারা যাবে না, যারা হুদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেনি এবং নানা তালবাহানার আশ্রয় নিয়েছে)। অতএব, আপনি বলে দিন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন আমরা মঞ্জুর করতে পারি না। কারণ, এতে আল্লাহ্র আদেশ পরিবর্তন করার গোনাহ্ আছে। কেননা,) আল্লাহ্ প্রথম থেকেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ [হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পথেই আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন যে, খায়বর যুদ্ধে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যতীত কেউ যাবে না। বাহ্যত এই আদেশ কোরআনে উল্লিখিত নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই আদেশ অপঠিত ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) লাভ করেছিলেন। এরূপ অপঠিত ওহী হাদীসের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। একথাও সম্ভবপর যে, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে অবতীর্ণ সূরা ফাত্হের أَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا আয়াতে খায়বরের বিজয় বোঝানো হয়েছে। সেমতে এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে যে, খায়বরের বিজয় হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারিগণই লাভ করবে। আপনার এই কথা শুনে উত্তরে] তখন তারা বলবে ঃ [বাহ্যত এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখের উপর বলা উদ্দেশ্য নয় ; বরং তারা অন্যদেরকে বলবে যে, আমাদেরকে সাথে না নেওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্র আদেশ নয়] বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। (তাই আমাদের অংশগ্রহণ তোমাদের মনঃপূত নয়। অথচ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের কোন নামগন্ধও নেই।) বরং তারা অল্পই বুঝে। (পুরাপুরি বুঝলে আল্লাহ্র এই আদেশের রহস্য অনায়াসেই বুঝতে পারত যে, হুদায়বিয়ায় মুসলমানরা একটি বৃহত্তর আশংকার সম্মুখীন হয়েছে এবং অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর মুনাফিকরা তাদের পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটাই বিশেষভাবে মুসলমানদের খায়বর যুদ্ধে যাওয়ার এবং মুনাফিকদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এ পর্যন্ত খায়বর সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। অতঃপর অপর একটি ঘটনা ইরশাদ হচ্ছে ঃ) আপনি পশ্চাতে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে (আরও) বলে দিন, (এক খায়বর যুদ্ধে না গেলে তাতে কি হল, সওয়াব হাসিল করার আরও অনেক সুযোগ ভবিষ্যতে আসবে। সেমতে) সত্বরই তোমরা এমন লোকদের প্রতি (যুদ্ধ করার জন্য) আহূত হবে, যারা কঠোর যোদ্ধা (এখানে পারস্য ও রোমের সাথে যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে)। [দুররে মনসূর] কেননা, তাদের সেনাবাহিনী ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য ও জিযিয়া দানে স্বীকৃত

হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এ কাজের জন্য আহূত হবে) অতএব (তখন) যদি তোমরা আনুগত্য কর (এবং তাদের সাথে জিহাদ কর) তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা তখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, যেমন ইতিপূর্বে (হুদায়বিয়া) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, তবে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (তবে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিগণ এর আওতা বহির্ভূত। সেমতে) অন্ধের জন্য কোন গোনাহ্ নেই, খঞ্জের জন্য কোন গোনাহ্ নেই এবং রুগ্নের জন্য কোন গোনাহ্ নেই। (উপরে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাত ও নিয়ামতের যে ওয়াদা এবং জিহাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের জন্য যে শাস্তির খবর উচ্চারিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে তাদের জন্যই নয় বরং) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর আনুগত্য করবে, তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত এবং যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাঁদেরকে সঙ্গে নিলেন, যাঁরা হুদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-কে খায়বর বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনীমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতিপূর্বে হুদায়বিয়ার সফরে আহূত হওয়া সত্ত্বেও ওযর পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল ; হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খায়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্র ব্যবহার ও হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এখন জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের জওয়াবে কোরআন বলেছে ঃ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ তারা আল্লাহ্র কালাম অর্থাৎ তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। এই আদেশের অর্থ খায়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ বাক্যেও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন' বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে ?

ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কোরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রসূলের হাদীসও আল্লাহ্র কালামের হুকুম রাখে ঃ আলিমগণ বলেন ঃ হুদায়বিয়ায়

অংশগ্রহণকারীদের বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লিখিত ওয়াদা কোরআন পাকের কোথাও স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করা হয়নি ; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা 'ওহী গায়র-মতলু' অর্থাৎ অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআনের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্ হাদীস-সমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহ্র কালাম'-ও আল্লাহ্র উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মভ্রষ্ট লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীসকে ধর্মীয় প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মভ্রষ্টতা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে আরও একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا——তফসীরবিদগণের ঐক-মত্যে এখানে 'নিকটবর্তী বিজয়' বলে খায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআন খায়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্র উক্তির' অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে ; কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, 'আল্লাহ্র কালাম' ও আল্লাহ্র উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, 'আল্লাহ্র কালাম' বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে ঃ

فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ـ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ـ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ـ

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যার সমকাল খায়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরী।——(কুরতুবী)

قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا——এতে হুদায়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদেরকে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খায়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোন জিহাদেও শরীক হতে পারবে না——আয়াত থেকে এটা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।——(রূহুল মা'আনী)

হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল ঃ হুদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল,

তাদের সবাইকে খায়বরের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাচ্চা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্য পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী খায়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনেপ্রাণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর প্রকাশ পাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ এক সময় আসবে, যখন তোমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধা জাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জিহাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমত, এরপর তিনি কোন যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণে নেই; দ্বিতীয়ত, এরপর এমন কোন বীরযোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলাও হয়নি, যাদের বীরত্বের উল্লেখ কোরআন পাক করছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলা ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণই হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম বিনাযুদ্ধে তাবুক থেকে ফিরে আসেন। হুনায়ন যুদ্ধেও মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোন সশস্ত্র ও বীরযোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মুকাবিলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কিসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর আমলে জিহাদ হয়েছে।---(কুরতুবী)

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন ঃ আমরা কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম; কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন্ জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে তিনি আমাদেরকে বনী হুনায়ফা ও মোসায়লামা কাযযাবের জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই আয়াতে এই জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর মধ্যে দাখিল থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কোরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

حَتّٰى يُسْلِمُوْا ——হযরত উবাই এর কিরাআতে تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী اَوْ অব্যয়কে حَتّٰى এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ ——হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) বলেন, উপরের আয়াতে যখন জিহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাতপদদের জন্য শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা জিহাদে অংশ-গ্রহণ করার যোগ্য নয়। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নকে জিহাদের আদেশের আওতা-বহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছে।---(কুরতুবী)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾ وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

(১৮) আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের হস্ত

করে দিয়েছেন---যাতে এটা মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই আল্লাহ্ (আপনার সফরসঙ্গী) মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা আপনার কাছে বৃক্ষের নীচে (জিহাদে দৃঢ়পদ থাকার) শপথ করছিল। তাদের অন্তরে যা কিছু (আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার সংকল্প) ছিল, আল্লাহ্ তাও অবগত ছিলেন। (তখন) আল্লাহ্ তাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দেন। (ফলে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তারা মোটেই ইতস্তত করেনি। এগুলো ছিল ইন্দ্রিয় বহির্ভূত নিয়ামত। এর সাথে কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামতও তাদেরকে দেওয়া হয়। সেমতে) তাদেরকে বিজয় দান করেন (অর্থাৎ খায়বর বিজয়) এবং (এই বিজয়ে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদও (দিলেন) যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (স্বীয় কুদরত ও রহস্য বলে যখন যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। এই খায়বর বিজয়ই শেষ নয়; বরং) আল্লাহ্ তোমাদেরকে (আরও) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, যা তোমরা লাভ করবে। অতএব (সেসব সম্পদের মধ্য থেকে) এটা তোমাদেরকে তাৎক্ষণিক দান করেছেন এবং (এই দানের জন্য খায়বরবাসী ও তাদের মিত্র) লোকদের হাত তোমাদের থেকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন, (অর্থাৎ সবার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে তারা আর বেশী হাত বাড়ানোর সাহস পায়নি। এতে করে তোমাদের পার্থিব উপকারও উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তোমরা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কর) এবং (ধর্মীয় উপকারও ছিল) যাতে এটা (অর্থাৎ এই ঘটনা) মু'মিনদের জন্য (অন্যান্য ওয়াদা সত্য হওয়ার) এক নিদর্শন হয় (অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আরও মজবুত হয়) এবং যাতে (এই নিদর্শনের মাধ্যমে) তোমাদেরকে (ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেক কাজে) সরল পথে পরিচালিত করেন (মানে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্র উপর ভরসার পথে। উদ্দেশ্য এই যে, চিরদিনের জন্য এই ঘটনা চিন্তা করে যাতে আল্লাহ্র প্রতি আস্থা রাখ। এভাবে ধর্মীয় উপকার দু'টি হয়ে যায়। এক জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত উপকার, যা وَلِتَكُوْنَ বলে বর্ণিত হয়েছে এবং দুই. কর্মগত ও চরিত্রগত উপকার, যা يَهْدِيَكُمْ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে)। এবং আরও একটি বিজয় (প্রতিশ্রুত) রয়েছে, যা (এ পর্যন্ত) তোমাদের অধিকারে আসেনি (অর্থাৎ মক্কা বিজয়। যা তখন পর্যন্ত বাস্তব রূপ লাভ করেনি) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা বেষ্টন করে আছেন (যখন ইচ্ছা করবেন, তোমাদেরকে দান করবেন) এবং (এরই কি বিশেষত্ব) আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ —এখানে

হুদায়বিয়ার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বেও اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তারই তাকীদ। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে 'বায় আতে রিযওয়ান' তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর তাকীদ করা। বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ انتم خير اهل الارض —অর্থাৎ তোমরা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ মুসলিমে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে ঃ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة —অর্থাৎ যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।—(মাযহারী) তাই এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে যেমন কোরআন ও হাদীসে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি হুদায়বিয়ার শপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্যও এরূপ সুসংবাদ উল্লিখিত আছে।

এসব সুসংবাদ সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সবার খাতেমা অর্থাৎ জীবনাবসান ঈমান ও পসন্দনীয় সৎকর্মের উপরে হবে। কেননা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়।

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা এই আয়াতের পরিপন্থী ঃ তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষমা ও মাগফিরাতের ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তাঁদের তরফ থেকে কোন ভুলত্রুটি অথবা গোনাহ্ হয়েও যায়, তবে এই আয়াত তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তাঁদের যে সব কর্মকাণ্ড প্রশংসার্হ ও উত্তম নয়, সেগুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই আয়াতের পরিপন্থী। রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর-নিফাকের দোষ আরোপ করে। আলোচ্য আয়াত তাদের উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

রিযওয়ান বৃক্ষ ঃ আয়াতে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবুল বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামায আদায় করত। হযরত ফারূকে আযম (রা) দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশংকায়

তিনি বৃক্ষটি কাটিয়ে দেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত তারেক ইবনে আবদুর রহমান বলেনঃ আমি একবার হজ্জে যাওয়ার পথে এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত হয়ে নামায পড়তে দেখলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কোন্ মসজিদ? তারা বলল ঃ এটা সেই বৃক্ষ, যার নীচে রসূলুল্লাহ্ (সা) রিযওয়ানের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমি অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেনঃ আমার পিতা বায়্'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেনঃ আমরা যখন পরবর্তী বছর মক্কায় উপস্থিত হই, তখন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাইনি। অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বললেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যেসব সাহাবী এই বায়্'আতে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাননি, আর তুমি তা জেনে ফেলেছ। আশ্চর্যের বিষয় বটে! তুমি কি তাঁদের চাইতে অধিক জ্ঞাত?---(রূহুল মা'আনী)

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা নিছক অনুমানের মাধ্যমে কোন একটি বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জড়ো হয়ে নামায পড়া শুরু করেছিল। হযরত ফারূকে আযম (রা) একথাও জানতেন যে, এটা সেই বৃক্ষ নয়। তাই অবান্তর নয় যে, তিনি শিরকের আশংকা বোধ করে সেই বৃক্ষটিও কর্তন করিয়ে দেন।

খায়বর বিজয়ঃ খায়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ, দুর্গ ও বাগ-বাগিচা সমন্বিত একটি বিশেষ এলাকার নাম।—(মাযহারী)

وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا—এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খায়বর বিজয়। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তব রূপ লাভ করে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কুড়ি দিন অবস্থান করেন। এরপর খায়বরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে-ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যিলহজ্জ মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খায়বর গমন করেন। সফর মাসে খায়বর বিজিত হয়। ওয়াকেদীর মাগাযী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজারের মতে এ অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।—(মাযহারী)

মোটকথা, প্রমাণিত হল যে, খায়বর বিজয়ের ঘটনা হুদায়বিয়ার সফরের বেশ কিছু দিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাত্হ যে হুদায়বিয়ার সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হ্যাঁ, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাযিল হয়েছিল, না কিছু সংখ্যক আয়াত পরে নাযিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহে খায়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে অকাট্য ও নিশ্চিত —একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا—এতে খায়বর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ—এখানে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র নির্দেশে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্য ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কিরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ—আয়াতে খায়বরবাসী কাফির সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এই জিহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেন নি। ইমাম বগভী বলেন ঃ গাতফান গোত্র খায়বরের ইহুদীদের মিত্র ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক খায়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খায়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ীঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। —(মাযহারী)

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا—সরল পথের আমল এবং হিদায়ত তো তাঁদের পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হিদায়তের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি।

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাধীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا

وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۭ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ
وَنِسَاۗءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَــــُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ
مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا
لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
سَكِيْنَتَهٗ عَلٰي رَسُوْلِهٖ وَعَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى
وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

(২২) যদি কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহ্‌র রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেওয়া হত ; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ্

তাঁর রসূল ও মু'মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য সংযমের বাক্য অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুত তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যেহেতু কাফিরদের পরাজিত হওয়ার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে, সেহেতু) যদি এই সন্ধি না হত; বরং) কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তবে (সেসব কারণবশত) অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত; অতঃপর তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। আল্লাহ্ (কাফিরদের জন্য) এই রীতিই করে রেখেছেন, যা পূর্ব থেকে চালু আছে (যে, মুকাবিলায় সত্যপন্থীরা জয়ী ও মিথ্যাপন্থীরা পরাজিত হয়। কখনও কোন রহস্য ও উপযোগিতার কারণে এতে বিলম্ব হওয়া এর পরিপন্থী নয়)। আপনি আল্লাহ্র রীতিতে (কোন ব্যক্তির তরফ থেকে) কোন পরিবর্তন পাবেন না (যে, আল্লাহ্ কোন কাজ করতে চাইবেন এবং কেউ তা হতে দেবে না)। তিনিই তাদের হাতকে তোমাদের থেকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে হত্যা করা থেকে) এবং তোমাদের হাতকে তাদের (হত্যা) থেকে মক্কায় (অর্থাৎ মক্কার অদূরে হুদায়বিয়ায়) নিবারিত করেছেন তোমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করার পর। [এখানে সূরার শুরুতে উল্লিখিত হুদায়বিয়ার কাহিনীর অষ্টম অংশে বর্ণিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম কোরাইশদের পঞ্চাশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিলেন। এছাড়া আরও কিছু লোক গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের অধিকারে চলে এসেছিল। তখন মুসলমানরা যদি তাদেরকে হত্যা করত, তবে অপরদিকে মক্কায় আটক হযরত ওসমান গনি (রা) ও কিছুসংখ্যক মুসলমানকেও কাফিররা হত্যা করে দিত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া। যদিও উল্লিখিত প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একথাও বলে দিয়েছেন যে, যুদ্ধ হলেও বিজয় মুসলমানের হত, তথাপি আল্লাহ্র জ্ঞানে তখন যুদ্ধ না হওয়ার মধ্যেই মুসলমানদের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত ছিল। তাই এদিকে কাফির বন্দীদেরকে হত্যা না করার বিষয়টি মুসলমানদের অন্তরে জাগরিত করে দিলেন। এখানে মুসলমানদের হাত তাদের হত্যা থেকে নিবারিত করলেন। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা কোরাইশদের অন্তরে মুসলমানদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা সন্ধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সোহায়েলকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পাঠিয়ে দিল। এভাবে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ না হওয়ার দ্বিমুখী ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন]। তোমরা যা করছিলে, আল্লাহ্ (তখন) তা দেখছিলেন (এবং তিনি তোমাদের কাজের পরিণতি জানতেন। তাই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার মত কোন কাজ হতে দেন নি। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যুদ্ধ হলে কাফিররা কিভাবে এবং কেন পরাজিত হত) তারাই তো কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে (ওমরা করার জন্য) মসজিদে-হারামে উপস্থিতি থেকে বাধা দিয়েছে। (এখানে মসজিদে-হারাম এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈর দূরত্ব এ উভয়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তওয়াফ যেহেতু আমল ও সর্বপ্রথম এবং তা মসজিদে-হারামে সম্পন্ন হয়, তাই শুধু মসজিদে-হারাম থেকে বাধা দেওয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে) এবং (হুদায়বিয়ায়) অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। জন্তু কুরবানীর

স্থান হচ্ছে মিনা। তারা জন্তুগুলোকে মিনা পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি। তাদের এহেন অপরাধ এবং পবিত্র হেরেমে বসে এহেন জুলুম করার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিয়ে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দেওয়া হোক। কিন্তু কোন কোন রহস্য এই দাবী পূরণের পথে অন্তরায় হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি রহস্য ছিল এই যে, তখন মক্কায় অনেক মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী ও নির্যাতিত ছিল। হুদায়বিয়ার কাহিনীর দশম অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আবূ জন্দলের ফরিয়াদের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে অজ্ঞাতসারে এসব মুসলমানও ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই তাদের নিহত হওয়ার আশংকা ছিল। ফলে সাধারণ মুসলমানগণ তাতে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন। পরবর্তী আয়াতে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে)। যদি (মক্কায় তখন) অনেক মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরাও দুঃখিত, অনুতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হতে, তবে সব কিস্‌সা চুকিয়ে দেওয়া হত ; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। (সেমতে যুদ্ধ না হওয়ার ফলে সেই মুসলমানগণ বেঁচে গেছে এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করার পরিতাপ থেকে মুক্ত রয়ে গেছ। তবে) যদি তারা (অর্থাৎ আটক মুসলমানরা মক্কা থেকে কোথাও) সরে যেত, তবে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফির, আমি তাদেরকে (মুসলমানদের হাতে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (এই কাফিরদের পর্যুদস্ত ও নিহত হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল) কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করত---মূর্খতা যুগের জেদ। (এই জেদ বলে বিসমিল্লাহ্ ও রসূল শব্দ লেখার বেলায় তাদের বাধাদানকে বোঝানো হয়েছে। উপরে হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের বর্ণনায় একথা উল্লিখিত হয়েছে) অতএব (এর ফলে মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়াই সঙ্গত ছিল ; কিন্তু) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল ও মু'মিনদের নিজের পক্ষ থেকে সহনশীলতা দান করলেন। (ফলে তাঁরা উপরোক্ত বাক্য লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করলেন না এবং সন্ধি হয়ে গেল) এবং (তখন) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাকওয়ার বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। তাকওয়ার বাক্য বলে কালেমায়ে-তাই-য়্যেবা অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের স্বীকারোক্তি বোঝানো হয়েছে। তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ এই যে, তওহীদ ও রিসালতে বিশ্বাস করার ফল হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য। মানসিক উত্তেজনার বিপরীতে মুসলমানরা যে সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল, তার একমাত্র কারণ ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ। এহেন কঠিন উত্তেজনাকর মুহূর্তে রসূল (সা)-এর আনুগত্যকেই তাকওয়ার বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বলা হয়েছে। বস্তুত তারাই (মুসলমানরাই) এর (অর্থাৎ তাকওয়ার বাক্যের দুনিয়াতেও) অধিক যোগ্য। (কারণ, তাদের অন্তরে সত্যের অন্বেষা রয়েছে। এই অন্বেষাই ঈমান পর্যন্ত পৌঁছায়) এবং (পরকালেও) এর (সওয়াবের) উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بِبَطْنِ مَكَّةَ—এর আসল অর্থ মক্কা শহরই ; কিন্তু এখানে হুদায়বিয়ার স্থান

বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে হুদায়বিয়াকেই 'বাতনে মক্কা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলিমগণ হুদায়বিয়ার কিছু অংশকে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কুরবানী করে ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কুরবানী বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যান্য কুরবানীর ন্যায় এর জন্যও হেরেমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের মতে এর জন্যই হেরেমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কুরবানীর জন্য কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌঁছতে কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে এই যে, খোদ হানাফী আলিমগণ একথাও বলেন যে, হুদায়বিয়ার কতক অংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হেরেমে প্রবেশে বাধাদান কিরূপে প্রমাণিত হয়? জওয়াব এই যে, যদিও এই কুরবানী হেরেমের যে কোন অংশে করে দেওয়া যথেষ্ট; কিন্তু মিনার অভ্যন্তরে 'মানহার' (কোরবানগাহ্) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কুরবানী করা উত্তম। কাফিররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

مَعَرَّةٌ—فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ শব্দের অর্থ কেউ কেউ গোনাহ্ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যত সঙ্গত। কারণ, যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হত। কাফিররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দীনী ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এ ছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হত।

সাহাবায়ে কিরামকে দোষত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা: ইমাম কুরতুবী বলেন: অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই। ভুলবশত হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-এর সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহ্‌র ব্যবহার।

لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আল্লাহ্

জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে।

تَزْيِيل—لَوْ تَزَيَّلُوْا শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফিরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফিরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফিরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا—'কলেমায়ে-তাকওয়া' বলে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামকে এই কলেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ্ তো তাঁদেরকে কলেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾
هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

(২৭) আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এ ছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়। (২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (২৯) মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপই এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে ---চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে---যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা বাস্তবের অনুরূপ। ইন্শাআল্লাহ্ তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, তোমাদের কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কর্তন করবে। (সেমতে পরবর্তী বছর তাই হয়েছে। এ বছর এরূপ না হওয়ার কারণ এই যে) আল্লাহ্ সেসব বিষয়-(ও রহস্য) জানেন, যা তোমরা জান না। (তন্মধ্যে একটি রহস্য এই যে) এর (অর্থাৎ এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার) আগে তোমাদেরকে (খায়বরের) একটি আসন্ন বিজয় দিয়েছেন (যাতে তদ্দ্বারা মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরঞ্জাম অর্জিত হয়ে যায় এবং তারা নিশ্চিন্তে ওমরা পালন করতে পারে। বাস্তব তাই হয়েছে) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য দীন (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (অর্থাৎ ইসলামকে) অন্য সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। (এই জয় প্রমাণ ও দলীলের দিক দিয়ে তো চিরকাল অক্ষয় থাকবে এবং শান-শওকত ও রাজত্বের দিক দিয়েও একটি শর্ত সহকারে প্রাধান্য থাকবে। শর্তটি এই যে, এই ধর্মাবলম্বীরা অর্থাৎ মুসলমানরা যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। এই শর্তের অনুপস্থিতিতে বাহ্যিক জয়ের ওয়াদা নেই। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই শর্ত বিদ্যমান ছিল। তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পরবর্তী আয়াতে এই যোগ্যতার উল্লেখ আছে। তাই এই আয়াত একদিকে যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের সুসংবাদ আছে, তেমনি অপরদিকে সাহাবায়ে কিরামের

জন্য বিজয় লাভেরও সুসংবাদ আছে। বাস্তবে তাই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত না হতেই ইসলাম ও কোরআন বিজয়ীবেশে বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। মূর্খতা যুগের জেদ পোষণকারীরা যদি আপনার নামের সাথে 'রসূল' শব্দ সংযুক্ত করে লিখতে অসম্মত হয়, তবে আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা, আপনার রিসালতের) সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (তিনি আপনার রিসালতকে সুস্পষ্ট যুক্তি ও প্রকাশ্য মো'জেযার মাধ্যমে সপ্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে) মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল। [এখানে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'---এই পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূর্খতা যুগের জেদ পোষণকারীরা আপনার নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্' লিখতে পছন্দ না করলে তাতে কি আসে যায়, আল্লাহ্ এই বাক্য আপনার নামের সাথে লিখে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসারী সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ] যারা সংসর্গপ্রাপ্ত, (এতে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন সংসর্গপ্রাপ্ত সকল সাহাবীই দাখিল আছেন। যারা হুদায়বিয়ায় তাঁর সহচর ছিলেন, তাঁরা বিশেষভাবে এই আয়াতের উদ্দেশ্য। মতলব এই যে, সকল সাহাবায়ে কিরামই এসব গুণে গুণান্বিত)। তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর (এবং) নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। (হে পাঠক) তুমি তাদেরকে দেখবে যে, কখনও রুকূ করছে, কখনও সিজদা করছে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করছে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন প্রস্ফুটিত। (এই চিহ্ন দ্বারা খুশু-খুযূ তথা বিনয় ও নম্রতার উজ্জ্বল আভা বোঝানো হয়েছে, যা মু'মিন ও পরহিযগার লোকদের চেহারায় প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়।) এগুলো (অর্থাৎ তাদের এই গুণাবলী) তওরাতে আছে এবং ইঞ্জিলে তাদের এই গুণ (উল্লিখিত) রয়েছে, যেমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর (মৃত্তিকা, পানি, বায়ু ইত্যাদি থেকে খাদ্য লাভ করে) তা শক্ত ও মজবুত হয়, অতঃপর আরও মোটা হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়, (সবুজ ও সতেজ হওয়ার কারণে) চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে (এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল। এরপর প্রত্যহ শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে এই ক্রমোন্নতি এজন্য দান করেছেন) যাতে (তাদের এ অবস্থা দ্বারা) কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ্ (পরকালে) তাদেরকে (গোনাহের) ক্ষমা এবং (ইবাদতের কারণে) মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হুদায়বিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। বলা বাহুল্য, সাহাবায়ে কিরাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যত এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন সত্য হল না। অপরদিকে কাফির-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রসূলের স্বপ্ন সত্য

নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ —আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। —(বায়হাকী)

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ—صدق শব্দটি كذب-এর বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে صدق এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে كذب বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা; যেমন কোরআনে আছে ঃ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ অর্থাৎ তারা তাদের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে।

এ সময় صدق শব্দের দু'টি مفعول থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مفعول হচ্ছে رسوله এবং দ্বিতীয় مفعول হচ্ছে رؤيا—আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা দেখিয়েছেন।—(বায়যাভী) যদিও এই সাচ্চা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত শব্দবাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে ঃ

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ —অর্থাৎ মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়—এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশত সাহাবায়ে কিরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে সিদ্দীকে আকবর (রা) প্রথমেই হযরত ওমর (রা)-এর জওয়াবে বলেছিলেন ঃ আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নে কোন সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে।—(কুরতুবী)

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য 'ইনশাআল্লাহ্' বলার তাকীদ ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদে-হারামে প্রবেশের সাথে—যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল—'ইনশাআল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু স্বীয় রসূল ও বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলাও 'ইনশা-আল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন।—(কুরতুবী)

مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ— সহীহ্ বুখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন।

এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (সা) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন। ---(কুরতুবী)

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا—অর্থাৎ এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হারামে

প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ্ জানতেন---তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল খায়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক।

এ কারণেই বলা হয়েছে ঃ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا—অর্থাৎ স্বপ্ন

বাস্তব রূপ লাভ করার আগে খায়বরের আসন্ন বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন, এই আসন্ন বিজয় বলে খোদ হুদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটাতে মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল।---(কুরতুবী)

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লিখিত হয়েছে। এখন সূরার উপ-সংহারে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নিয়ামত ও সুসংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য, রিসালত অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দূরীকরণের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ—সমগ্র কোরআনে শেষ নবী (সা)-র নাম উল্লেখ করার

পরিবর্তে সাধারণত গুণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

বিশেষত আহ্বানের স্থলে يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা হয়েছে ; যেমন يَا عِيسَى - يَا مُوسَى - يَا إِبْرَاهِيمُ সমগ্র কোরআনে মাত্র চার জায়গায় তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রা) যখন তাঁর নাম 'মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্' লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাফিররা এটা মিটিয়ে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্' লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দ কোরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

وَالَّذِينَ مَعَهُ—এখান থেকে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ; কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি ঃ এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর দীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহীত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা, অন্তরগত বিশ্বাস ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের এতটুকু পদস্খলন হয়নি বরং তাঁরা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পর দুনিয়াতে আর কোন নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্য কোরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসাবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কোরআনও তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাফিরদের মুকাবিলায় বজ্র-কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁদের কঠোরতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্য বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আহ্বান জানায়। কোরআন

সাহাবায়ে কিরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা, এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালবাসা অথবা হিংসাপরায়ণতা কোন কিছুই নিজের জন্য নয় ; বরং সব আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের জন্য হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে : من احب لله وا بغض لله فقد استكمل ايما نه অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভালবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম কাফিরদের মুকাবিলায় কঠোর ছিলেন---এ কথার অর্থ এরূপ নয় যে, তাঁরা কোন সময় কোন কাফিরের প্রতি দয়া করেন না ; বরং অর্থ এই যে, যে স্থলে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক এ কাজে অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কোরআনের ফয়সালা এই যে :

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ — — أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ—অর্থাৎ যেসব কাফির মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যত যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেন না। রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, যেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফিরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্য-মূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনেও ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কিরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণত রুকূ-সিজদা ও নামাযে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ, আমল-সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামায। سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ নামায তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামায ও সিজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে 'সিজদার চিহ্ন' বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সিজদার কাল দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাযের ফলে উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশী ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : من كثر صلوته با لليل حسن وجهه بالنها ر অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রে বেশী নামায পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : এর অর্থ নামাযীদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ

উপরে সাহাবায়ে কিরামের সিজদা ও নামাযের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তই তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলে তাঁদের আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্য সংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন—পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা), নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন কি, বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে হজ্জে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ এক. فِي التَّوْرَاةِ এ পাঠবিরতি করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ—এ পাঠবিরতি না করা তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত সেই চারাগাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্ত কাণ্ড-বিশিষ্ট হয়ে যায়।

দুই. فِي التَّوْرَاةِ এ পাঠবিরতি না করা, বরং فِي الْإِنْجِيلِ এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতেও রয়েছে, ইঞ্জীলেও রয়েছে। অতঃপর كَزَرْعٍ-কে একটি আলাদা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা। তিন. فِي التَّوْرَاةِ এ বাক্য না করা এবং فِي الْإِنْجِيلِ এও শেষ না করা। অতঃপর ذٰلِكَ-কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীল উভয়ের মধ্যে সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত চারাগাছের ন্যায়। বর্তমান যুগে তওরাত ও ইঞ্জীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দৃষ্টান্ত তওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে আছে। ঈমাম বগভী (র) বলেন ঃ ইঞ্জীলে

সাহাবায়ে কিরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারাগাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। (মাযহারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে ঃ

> খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্য একটি অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত ছিল। তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালবাসেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। —(তওরাত ঃ বাবে এস্তেস্না)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ্' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত থাকবে বলে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ —এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালবাসবেন—কথা থেকে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। ইযহারুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানভী (র) খৃস্টান মতবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার জন্য ফিল্ডার নামক পাদ্রীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মত, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সবজির চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। (ইঞ্জীল ঃ মাত্তা) ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে ঃ সে বলল, আল্লাহ্‌র রাজত্ব এমন, যেমন কোন ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অংকুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরী দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা, কাটার সময় এসে গেছে।—(ইযহারুল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে উল্লিখিত গুণে

গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবূ ওরওয়া যুবায়রী (র) বলেন ঃ একবার আমরা ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোন একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালিক (র) উপরোক্ত আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করে যখন لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন ঃ যার অন্তরে কোন একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে।—(কুরতুবী) ইমাম মালিক (র) একথা বলেন নি যে, সে কাফির হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সে-ও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফিরদের কাজের অনুরূপ হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

مِنْهُمْ-এর **مِنْ** অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কিরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক **مِنْ**-এর ব্যবহার কোরআনে প্রচুর ; যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ এখানে مِنَ الْاَوْثَانِ বলে رِجْس-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে **مِنْهُمْ** বলে **الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** -এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ স্থলে **مِنْ**-কে 'কতক'-এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহের পরিষ্কার পরিপন্থী। কেননা, যে সব সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে-রিযওয়ানে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট। তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ—সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎ কর্মের উপর কায়েম থাকেন। কারণ, আল্লাহ্ আলিম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারও সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোন-না-কোন সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ্ স্বীয়

সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (র) ইস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدًا অর্থাৎ আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বায়‘আতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যই যখন মুখ্যত এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারও কারও বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কিরাম সবাই আদিল ও সিকাহ্।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গোনাহ্ ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এই সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে ঃ

الزمهم كلمة التقوٰى وكانوا احق بها এবং لقد رضى الله عن المؤمنين

এছাড়া আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ - وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ -

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ তাঁদের সবাইকে আল্লাহ্ ‘হুসনা’ তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আম্বিয়ায় হুসনা’ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ

مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ফয়সালা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা, (ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না এমনকি অর্ধ মুদেরও

না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম, যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি।---(বুখারী) হযরত জাবের (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে চারজনকে আমার জন্য পছন্দ করেছেন—আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)। —(বাযযার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

الله الله فى اصحابى لا تتخذ وهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه ـ

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়। যে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ্ আযাবে গ্রেফতার করবেন।---(তিরমিযী)

আয়াত ও হাদীস এ সম্পর্কে অনেক। 'মকামে-সাহাবা' নামক গ্রন্থে আমি এগুলো সন্নিবেশ করেছি। সব সাহাবীই যে আদিল ও সিকাহ্---এ সম্পর্কে সমগ্র উম্মত একমত। সাহাবায়ে-কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা ও ঘাঁটাঘাঁটি করা অথবা চুপ থাকার বিষয়টিও এই গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত হয়েছে। প্রয়োজন মাফিক তার কিছু অংশ সূরা মুহাম্মদের তফসীরে স্থান পেয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে!

سورة الحجرات

সূরা হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৮, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٢ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ
اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٣ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۗءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤ وَلَوْ اَنَّهُمْ
صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে।

(১) মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। (২) মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেই রূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (৩) যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৪) যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। (৫) যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে

আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সূরার যোগসূত্র ও শানে-নুযূল ঃ পূর্ববর্তী দুই সূরায় জিহাদের বিধান ছিল, যদ্দ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষত সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে——তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। হযরত আবূ বকর (রা) কা'কা' ইবনে হাকিমের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত ওমর (রা) আকরা' ইবনে হাবেসের নাম পেশ করলেন। এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হল এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(বুখারী)

মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের (অনুমতির) আগে (কোন কথা কিংবা কাজে) অগ্রণী হয়ো না। [অর্থাৎ যে পর্যন্ত শক্তিশালী ইঙ্গিতে অথবা স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্তার অনুমতি না হয়, কথাবার্তা বলো না; যেমন উপরোক্ত ঘটনায় অপেক্ষা করা উচিত ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে কিছু বলুন অথবা উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। এরূপ অপেক্ষা না করেই নিজের পক্ষ থেকে কথাবার্তা শুরু করে দেওয়া সমীচীন ছিল না]। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তোমাদের সব কথাবার্তা) শুনেন (এবং তোমাদের ক্রিয়া-কর্ম) জানেন। মু'মিনগণ, তোমরা পয়গম্বরের কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেমন খোলাখুলি কথাবার্তা বল, পয়গম্বরের সাথে সেরূপ খোলাখুলি কথাবার্তা বলো না। (অর্থাৎ পরস্পরে কথা বলার সময় তাঁর সামনে উঁচুস্বরে কথা বলো না এবং স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলার সময় সমান স্বরে বলো না)। এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অজ্ঞাতসারে নিষ্ফল হয়ে যাবে। [উদ্দেশ্য এই যে, দৃশ্যত নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে কথা বলা এবং পরস্পরে খোলাখুলি কথা বলার অনুরূপ উঁচুস্বরে কথা বলা এক প্রকার ধৃষ্টতা। অনুসারী ও খাদিমের পক্ষ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা অপছন্দনীয় ও কষ্টদায়ক হতে পারে। আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেওয়া যাবতীয় সৎকর্মকে বরবাদ করে দেওয়ার নামান্তর। তবে মাঝে মাঝে মানসিক প্রফুল্লতার সময় এরূপ ব্যবহার অসহনীয় হয় না। তখন রসূলের জন্য কষ্টদায়ক না হওয়ার কারণে এ ধরনের কথাবার্তা সৎকর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ হবে না। কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা কখন অসহনীয় ও কষ্টদায়ক হবে না, তা জানা বক্তার পক্ষে সহজ নয়। বক্তা হয়ত এরূপ মনে করে কথা বলবে যে, এই কথায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট হবে না; কিন্তু বাস্তবে তা দ্বারা কষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার কথা তার সৎ কর্মকে বরবাদ করে দেবে; যদিও সে ধারণাও করতে পারবে না যে, তার এই কথা দ্বারা তার কতটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই কণ্ঠস্বর উঁচু করতে

এবং জোরে কথা বলতে সর্বাবস্থায় নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ ধরনের কিছু সংখ্যক কথাবার্তা যদিও কর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ নয়; কিন্তু তা নির্দিষ্ট করা কঠিন। তাই যাবতীয় খোলাখুলি কথাবার্তাই বর্জন করা বিধেয়। এ পর্যন্ত উঁচুস্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর কণ্ঠস্বর নীচু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে ঃ]

নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাদের অন্তরে তাকওয়ার পরিপন্থী কোন বিষয় আসেই না ঃ উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, এই বিশেষ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ তাকওয়া গুণে গুণান্বিত। তিরমিযীর এক হাদীসে পূর্ণ তাকওয়ার বর্ণনা এরূপ ভাষায় বিবৃত হয়েছে ঃ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به اخذ وا لما به باس অর্থাৎ বান্দা ততক্ষণ পূর্ণ তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে গোনাহ্ নয়, এমন কিছু বিষয়ও বর্জন করে। এই ভয়ে যে, এগুলো তাকে গোনাহে লিপ্ত করে দিতে পারে। অর্থাৎ গোনাহের আশংকা আছে, এমন বিষয়াদিকেও সে বর্জন করে। উদাহরণত কণ্ঠস্বর উঁচু করার এমন এক প্রকার আছে, যাতে গোনাহ্ নেই। অর্থাৎ যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কষ্ট হয় না এবং এক প্রকার এমন আছে, যাতে গোনাহ্ আছে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কষ্ট হয়। এখন পূর্ণ তাকওয়া হল সর্বাবস্থায় কণ্ঠস্বর উঁচু করাকে বর্জন করা। অতঃপর তাদের কর্মের পারলৌকিক ফায়দা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহের ঘটনা এই যে, এই বনী তামীম গোত্রই যখন পুনরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়, তখন তিনি বাড়ীর বাইরে ছিলেন না। বরং বিবিগণের কোন এক কক্ষে ছিলেন। তারা ছিল আনাড়ি গ্রাম্য লোক। সেমতে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁর নাম উচ্চারণ করে ডাকতে লাগল ঃ يا محمد اخرج الينا হে মুহাম্মদ, আমাদের কাছে বের হয়ে আসুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(দুররে মনসূর) যারা কক্ষের বাইরে থেকে আপনাকে চিৎকার করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ (বুদ্ধিমান হলে আপনার সাথে শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার করত এবং এভাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত না। اكثرهم বলার কারণ হয় এই যে, তাদের কেউ কেউ আসলে অবুঝ ছিল না, অন্যের দেখাদেখি এ কাজে লিপ্ত হয়েছিল। না হয় যাতে কেউ উত্তেজিত না হয়, সেজন্য اكثرهم বলা হয়েছে। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই ধারণা করতে পারে যে, বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। ওয়ায-নসিহতের ক্ষেত্রে উত্তেজনাকর কথাবার্তা থেকে সাবধান থাকাই নিয়ম)। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত (সামান্য) সবর (ও অপেক্ষা) করত, তবে এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত (কেননা এটাই ছিল শিষ্টাচারের কথা। তারা এখনও তওবা করলে ক্ষমা পাবে, কেননা,) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র) বলেনঃ সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বুখারীর বর্ণনা মতে তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ—بين اليدين এর আসল অর্থ দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে, কোরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কথায় অথবা কাজে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অগ্রণী হয়ো না। বরং তাঁর জওয়াবের অপেক্ষা কর। তবে তিনিই যদি কাউকে জওয়াবদানের আদেশ করেন, তবে সে জওয়াব দিতে পারে। এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তাঁর আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অগ্রে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা; যেমন সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছু সংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা হত।

আলিম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ঃ কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলিম ও মাশায়েখের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর। কেননা, তাঁরা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিম্নোক্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূদ্দারদা (রা)-কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন ঃ তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমা থেকে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন ঃ দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরগণের পর হযরত আবূ বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।—(রূহুল-বয়ান) তাই আলিমগণ বলেন যে, ওস্তাদ ও পীরের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ—নবী কমীম (সা)-এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উঁচুস্বরে কথা বলা—যেমন পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার বে-আদবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) আরয করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আল্লাহ্র কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব।—(বায়হাকী) হযরত ওমর (রা) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হত। —(সেহাহ্) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে ক্রন্দন করলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন।—(দুররে-মনসূর)

রওযা মোবারকের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ ঃ কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলিম বলেন ঃ তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খিলাফ। এমনভাবে যে মজলিসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টগোল করা বেআদবী। কেননা, তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হত, তখন সবার জন্য চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরী ছিল। এমনিভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে বাক্যাবলী শুনানো হয়, সেখানে হট্টগোল করা বেআদবী।

মাস'আলা ঃ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের উপর অগ্রণী হওয়ার নিষেধাজ্ঞায় যেমন আলিমগণ দাখিল আছেন, তেমনিভাবে আওয়ায উঁচু করারও বিধান তাই। আলিমগণের মজলিসে এত উঁচুস্বরে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়ায চাপা পড়ে যায়।—(কুরতুবী)

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ—অর্থাৎ তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাও না। এ স্থলে শরীয়তের স্বীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় ঃ এক. আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের ঐকমত্যে একমাত্র কুফরই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সৎ কর্ম বিনষ্ট হয় না। এখানে মু'মিন তথা সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শব্দযোগে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফর নয়। অতএব আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? দুই. ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মু'মিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় কুফর অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফির হতে পারে না। এখানে আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টত وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা টেরও পাবে না। অতএব এখানে খাঁটি কুফরের শাস্তি সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমানগণ, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করা এবং উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আশংকার কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অগ্রণী হওয়া

অথবা তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার মধ্যে তাঁর শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী হওয়ারও আশংকা আছে, যা রসূলকে কষ্টদানের কারণ। রসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোন কাজ সাহাবায়ে কিরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কল্পনাও করা যায় না, কিন্তু অগ্রণী হওয়া ও কণ্ঠস্বর উঁচু করার মত কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তদ্দ্বারা কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন গোনাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই গোনাহ্ করে, তাদের থেকে তওবা ও সৎ কর্মের তওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা গোনাহে অহর্নিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কষ্ট দেওয়া এমনি গোনাহ্, যদ্দ্বারা তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কণ্ঠস্বর উঁচু করা দ্বারাও তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার এবং অবশেষে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আংশকা থাকে। ফলে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই কুফর ও সৎ কর্ম নিষ্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন কোন আলিম বলেনঃ বুযুর্গ পীরের সাথে ধৃষ্টতা ও বেআদবী ও মাঝে মাঝে তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের সম্পদও বিনষ্ট করে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

—এই আয়াতে নবী করীম (সা)-এর তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরীফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষত গোঁয়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহবান করা বেআদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। حجرات শব্দটি حجر-এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে حجر বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সা)-এর নয়জন বিবি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব হুজরায় তশরীফ রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতক্রমে লিখেনঃ এসব হুজরা খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কাল পশমী পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (র) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কায়েসের উক্তি বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি এসব হুজরার যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, হুজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয়-সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। মদীনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেন নি।

শানে-নুযূলঃ ইমাম বগভী (র) কাতাদাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন,

বনূ তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল গ্রাম্য এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল ঃ اخرج الينا يا محمد—এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এভাবে ডাকা-ডাকি করতে নিষেধ করা হয় এবং অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়। মসনদে আহমদ, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থেও এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের আলিম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে—আমি যখন কোন আলিম সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন ঃ হে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচাত ভাই, আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর উত্তরে বলতেন ঃ আলিম জাতির জন্য পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হযরত আবূ ওবায়দা (র) বলেন ঃ আমি কোন দিন কোন আলিমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দিইনি ; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাৎ করব।—(রূহুল-মা'আনী)

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতে اليهم কথাটি যুক্ত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, ততক্ষণ সবর ও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ তিনি আগন্তুকদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য বাইরে আসেন। যদি অন্য কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে আসেন, তখনও নিজের মতলব সম্পর্কে কথা বলা সমীচীন নয় ; বরং তিনি নিজে যখন আগন্তুকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন বলতে হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟
قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾

(৬) মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, (যাতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে) তবে (যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করো না; বরং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে) তা খুব পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর এই আয়াত অবতরণের ঘটনা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বনূ মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে মেরার বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবূল করে যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং বললাম ঃ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে, আমি তাদের যাকাত একত্র করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোন দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দূত আগমন করল না, তখন হারেস আশংকা করলেন যে, সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানো কিছুতেই সম্ভবপর নয়। হারেস এই আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করলেন এবং সবাই মিলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা) নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-র মনে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তাঁর পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও তাঁরা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) রাগান্বিত হয়ে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিক দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হল এবং ওদিক থেকে হারেস তাঁর সঙ্গিগণসহ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বের হলেন। মদীনার অদূরে উভয় দল মুখোমুখি হল। মুজাহিদ বাহিনী দেখে হারেস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা কোন্ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হল ঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে প্রেরণ ও তাঁর প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হল এবং ওয়ালীদের এই বিবৃতিও শুনানো হল যে, বনূ মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাঁকে

হত্যার পরিকল্পনা করেছে। একথা শুনে হারেস বললেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলীদ ইবনে ওকবাকে দেখি-ওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেন ঃ কখনই নয়, সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশংকা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোন ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে -কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) নির্দেশ অনুযায়ী বনূ মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছেন। গোত্রের লোকেরা পূর্বেই জানত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূত অমুক তারিখে আগমন করবে। তাই তারা অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করলেন যে, তারা বোধ হয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাকে হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। সেমতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেন যে, তারা যাকাত দিতে সম্মত নয়; বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) রাত্রি বেলায় বস্তির নিকটে পৌঁছে গোপনে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইসলামের বিপরীত কোন কিছু নেই। খালিদ (রা) ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (এটা ইবনে কাসীরের একাধিক রেওয়ায়েতের সার-সংক্ষেপ)।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়।

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাস'আলা ঃ ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, এই আয়াতে এক কিরাআত হচ্ছে ঃ فَتَثَبَّتُوا

অর্থাৎ তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করো না; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসিকের খবর কবুল করা যখন না-জায়েয তখন সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কেননা, সাক্ষ্য এমন একটি খবর,

যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। এ কারণেই অধিকাংশ আলিমের মতে ফাসিকের খবর অথবা সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে ফাসিকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম। কেননা, আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়, অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণত কোন ফাসিক বরং কাফিরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েয। ফিকহ্ গ্রন্থে এর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসিক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ফাসিকও হতে পারে। এটা الصحابة كلهم عدول এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ সকল সাহাবীই সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের কোন খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা আলূসী (র) রূহুল-মা'আনীতে বলেন ঃ অধিকাংশ আলিম যে মাযহাব ও মতবাদ গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহও সংঘটিত হতে পারে, 'যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ্ হলে তাঁদের বেলায়ও শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ্ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ্ থেকে তওবা করে পবিত্র হন নি। কোরআন পাক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ্ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হয় না। কাযী আবূ ইয়ালা (র) বলেন ঃ সন্তুষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি চিরাগত গুণ। তিনি তাদের জন্যই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে গুণাগুণতি কয়েকজন দ্বারা কখনও কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হয়েছেন। রসূলে করীম (সা)-এর সংসর্গের বরকতে শরীয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ অথবা গোনাহ্ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্লভ ছিল। তাঁদের অসংখ্য সৎ কর্ম ছিল। নবী করীম (সা) ও ইসলামের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্য এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মুকাবিলায় সারা জীবনের মধ্যে কোন গোনাহ হয়ে গেলেও তা স্বভাবতই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর

রসূল (সা)-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন; বরং নিজেকে শাস্তির জন্য নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্ করেনি। তৃতীয়ত কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্য কাজ নিজেও গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ---বিশেষত সাহাবায়ে কিরামের পুণ্যকাজ গোনাহের কাফফারা হবেই। কারণ, তাঁদের পুণ্য কাজ সাধারণ লোকদের মত ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

والله لمشهد رجل منهم مع النبى صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح -

"আল্লাহ্র কসম, তাঁদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নবী করীম (সা)-এর সাথে জিহাদে শরীক হওয়া---যাতে তাঁর মুখমণ্ডল ধূলি ধূসরিত হয়ে যায়---তোমাদের সারা জীবনের ইবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে নূহ (আ)-এর আয়ুষ্কাল দান করা হয়।" অতএব গোনাহ্ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেওয়া হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তাঁদের কাউকে ফাসিক সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যুগে কোন সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসিক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসিক বলা বৈধ নয়। ---(রূহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-র ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসিক বলা হয়েছে---একথা অকাট্যরূপে জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসিক বলার মত কোন কাজ তিনি করেন নি। এই ঘটনায়ও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেই তিনি মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে একটি বাস্তবে ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনায়াসেই তা হতে পারে, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াত ফাসিকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) ফাসিক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল তাঁর খবরের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরে ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না, তখন ফাসিকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী

ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও সুস্পষ্ট। সাহাবীগণের 'আদালত' সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ আয়াতেও বর্ণিত হবে।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(৭) তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৮) এটা আল্লাহ্‌র কৃপা ও নিয়ামত, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল (বিদ্যমান) আছেন (যা আল্লাহ্‌র বড় নিয়ামত ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الخ—এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এই যে, কোন ব্যাপারে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না যদিও তা পার্থিব ব্যাপার হয় এবং পার্থিব ব্যাপারাদিতে তিনি তোমাদের মতামত মেনে নেবেন, এরূপ চিন্তা করো না। কেননা) তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। (কারণ, সেটা উপযোগিতার খেলাফ হলে তদনুযায়ী কাজ করার মধ্যে অবশ্যই ক্ষতি হবে। কিন্তু রসূলের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে সেরূপ হবে না। কেননা, পার্থিব ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও সেটা উপযোগিতার খেলাফ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও অবান্তর ও নবুওয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু প্রথমত এরূপ সম্ভাবনা বিশিষ্ট ব্যাপার খুবই কম হবে। হলে যদিও তাতে উপযোগিতা নষ্টও হয়ে যায়, তবে এই উপযোগিতার বিকল্প অর্থাৎ পুরস্কার ও রসূলের আনুগত্যের সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু তোমাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে খুব নগণ্য সংখ্যক ব্যাপার এমন হবে, যাতে উপযোগিতা তোমাদের মতামতের অনুকূলে থাকবে ; কিন্তু তা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে ক্ষতির আশংকাই বেশী থাকবে এবং এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'অনেক বিষয়ে' কথাটির উপকারিতাও জানা গেল। মোটকথা, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের মতানুযায়ী কাজ করলে তোমরাই বিপদগ্রস্ত হতে) কিন্তু আল্লাহ (তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন এভাবে

যে) তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করেছেন এবং তা (অর্জনকে) হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফর, পাপাচার (অর্থাৎ কবিরা গোনাহ্) ও (যে কোন) নাফরমানীর (অর্থাৎ সগীরা গোনাহ্র) প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (ফলে তোমরা সর্বদা রসূলের সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর এবং রসূলের সন্তুষ্টি বিধানকারী নির্দেশাবলী মেনে চল। সেমতে তোমরা যখন জানতে পেরেছ যে, সাংসারিক বিষয়াদিতেও রসূলের আনুগত্য ওয়াজিব এবং পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না, তখন তোমরা অনতিবিলম্বে এই নির্দেশও কবুল করে নিয়েছ এবং কবুল করে ঈমানকে আরও পূর্ণ করে নিয়েছ)। তারাই আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহে সৎ পথ অবলম্বনকারী। আল্লাহ্ (এসব নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, তিনি এসবের উপকারিতা সম্পর্কে) সবিশেষ জ্ঞাত এবং (যেহেতু তিনি) প্রজ্ঞাময়, (তাই এসব নির্দেশ ওয়াজিব করে দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর আগের আয়াতে ওলীদ ইবনে ওকবা ও মুস্তালিক গোত্রের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। ওলীদ ইবনে ওকবা মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মুস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইবনে ওকবার খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের খেলাফ মনে করে কবুল করেন নি এবং তদন্তের জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কোরআন এ বিষয়কে আইনের রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কিরামকে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও বনূ মুস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে ছিল; কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। রসূলের অবলম্বিত পন্থাই উত্তম ছিল।---(মাযহারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোন মত পেশ করা তো দুরস্ত; কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা যে, রসূল (সা) এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরস্ত নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রসূলের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসূল যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কুত্রাপি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রসূলের আনুগত্যের খাতিরে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রসূলের আনুগত্যের পুরস্কার ও সওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে। عنتم শব্দটি

عنت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গোনাহ্ও হয় এবং কোন বিপদে পতিত হওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।---(কুরতুবী)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(৯) যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে---যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের মূল কারণ দূর করে যুদ্ধ বন্ধ করিয়ে দাও)। অতঃপর যদি (মীমাংসার চেষ্টার পরও) তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, (এবং যুদ্ধ-বিরতি কার্যকর না করে) তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহ্র নির্দেশ বলে যুদ্ধ-বিরতি বোঝানো হয়েছে)। এরপর যদি আক্রমণকারী দল (আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে) ফিরে আসে (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়), তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ শরীয়তের বিধানানুযায়ী ব্যাপারটি মীমাংসা করে দাও। শুধু যুদ্ধ বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়ো না। মীমাংসা না হলে পুনরায় যুদ্ধ বাধাবার আশংকা থাকবে)। এবং ইনসাফ কর। (অর্থাৎ কোন মানসিক স্বার্থকে প্রবল হতে দিয়ো না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (পারস্পরিক মীমাংসার আদেশ দেওয়ার কারণ এই যে) মু'মিনরা তো (ধর্মীয় অভিন্নতা তথা আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে একে অপরের) ভাই। অতএব তোমাদের দুই ভাইয়ের

মধ্যে মীমাংসা করে দাও (যাতে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে)। এবং (মীমাংসার সময়) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (অর্থাৎ শরীয়তের মীমাংসার প্রতি লক্ষ্য রাখ), যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হক, আদব এবং তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত-সমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত রীতিনীতি এবং পারস্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। অপরকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।

শানে-নুযূল ঃ এসব আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরীক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জিহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে। ---(বাহর ; রূহুল মা'আনী) পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, আমির, সরদার অথবা বাদশাহ্ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবদমান উভয় পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারও বিরোধিতা এবং কারও পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না। ---(বয়ানুল কোরআন)

মাসায়েল ঃ মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। এক. বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না কিংবা এক দল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদিল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিক্‌হ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাঁদী করা হবে না এবং তাদের ধনসম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যর্পণ করা

হবে। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে শুধু যুদ্ধ-বিরতিই যথেষ্ট হবে না; বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোন পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাকীদ করেছে।—(বয়ানুল কোরআন)

মাস'আলা ঃ যদি মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যদ্দ্বারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত।—(মাযহারী)

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয হবে না।—(মাযহারী)

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদিল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদিল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জমল ও সিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ ঃ ইমাম আবূ বকর ইবনে আরাবী (রা) বলেন ঃ এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গে-জমল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

কোন সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েয নয়। কারণ, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সবদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা, সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম (সা) তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত তালহা (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ أن طلحة شهيد يمشى على وجه الارض অর্থাৎ তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলী (রা)-র বিরুদ্ধে হযরত তালহা (রা)-র যুদ্ধের জন্য বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ্ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্য শাহাদতের মর্তবা অর্জিত হত না। কারণ, শাহাদত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যুবায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়্যা-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হল যে, হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহ্গার ছিলেন না। এরূপ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন—এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভৎর্সনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসিক সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের ফযিলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জওয়াবে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জওয়াবে অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেন নি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন এক পক্ষকে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন ঃ আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যান নি। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা, এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বসরী (র) সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব।

হযরত মুহাসেবী (র) বলেন ঃ আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ

بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

(১১) হে মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে, তারাই জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, পুরুষরা যেন অপর পুরুষদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারীদের) অপেক্ষা (আল্লাহ্র কাছে) উত্তম হতে পারে এবং নারীরাও যেন অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারিণীদের) অপেক্ষা (আল্লাহ্র কাছে) শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (কেননা, এগুলো গোনাহ্)। বিশ্বাস স্থাপন করার পর (মুসলমানের প্রতি) গোনাহ্র নাম আরোপিত হওয়া (-ই) মন্দ। (অর্থাৎ মুসলমানকে এ কথা বলা যে, সে আল্লাহ্র নাফরমানী করে যা ঘৃণার বিষয়। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাক)। যারা (এহেন কাজ থেকে) বিরত না হয়, তারা জালিম (অর্থাৎ বান্দার হক নষ্টকারী। জালিমরা যে শাস্তি পাবে, তারাও তাই পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম (সা)-এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতিনীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক. কোন মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা ; দুই. কাউকে দোষারোপ করা, এবং তিন. কাউকে অপমান করা অথবা পীড়াদায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেনঃ কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে تمسخر - سخريه ও استهزاء বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা ব্যঙ্গ অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেনঃ শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে تمسخر ও سخريه বলা হয়। কোরআনের বর্ণনা মতে এগুলো সব হারাম।

কোরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে سخريه তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতিকে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত, যদিও রূপক ভঙ্গিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কোরআন পাক সাধারণত পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এখানে 'কওম' শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে نساء শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্‌র কাছে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এমনিভাবে যে নারী অপর নারীকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্‌র কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কোরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তা-ও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই ওঠে না। আয়াতের সারমর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠন-প্রকৃতিতে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা, তার জানা নেই যে, সম্ভবত এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এই আয়াত পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমর ইবনে শোরাহ্‌বিল (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে যাই। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে যে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই।—(কুরতুবী)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধনদৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী বলেন ঃ এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল অথবা মন্দ বলে দেওয়া জায়েয নয়। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আমরা খুব ভাল মনে করছি, সে আল্লাহ্‌র কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুকর্মের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুকর্মে লিপ্ত দেখ, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে কর; কিন্তু তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত মনে করার অনুমতি নেই। আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে لمز—এর অর্থ কারও দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভর্ৎসনা করা, ইরশাদ হয়েছে ঃ لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ —অর্থাৎ

তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাক্যটি لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ-এর মতই, যার অর্থ তোমরা নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা এক দিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, প্রায়ই তো এরূপ হয়েই যায় যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সমর্থকরা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে দেওয়া لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ-এর অর্থ তাই। অর্থাৎ তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সে-ও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। জনৈক আলিম বলেন ঃ وفيك عيوب وللناس اعين অর্থাৎ তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ দেখে। তুমি কারও দোষ বের করলে সে-ও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সেই কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম নিজেরই দুর্নাম।

আলিমগণ বলেন ঃ নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা সংশোধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। যে এরূপ করে, সে অপরের দোষ বের করা ও বর্ণনা করার অবসরই পায় না। হিন্দুস্তানের সর্বশেষ মুসলমান বাদশাহ্ যুফর চমৎকার বলেছেন ঃ

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر - رہے دیکھتے لوگونکے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر - تو جہان میں کوئی برا نہ رہا

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্দরুন সে অসন্তুষ্ট হয়। উদাহরণত কাউকে খঞ্জ, খোঁড়া অথবা অন্ধ বলে ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবূ জুবায়ের আনসারী (রা) বলেন ঃ এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেওয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনি সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম বলতেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে এই নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ-এর অর্থ হচ্ছে কেউ কোন গোনাহ্ অথবা মন্দ কাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দ কাজের নামে

ডাকা। উদাহরণত চোর, ব্যভিচারী অথবা শরাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, যিনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেওয়া ও হেয় করা হারাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গোনাহ্ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেন।---(কুরতুবী)

কোন কোন নামের ব্যতিক্রম ঃ কোন কোন লোকের এমন নাম খ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নামে ডাকা জায়েয। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত; যেমন কোন কোন মুহাদ্দিসের নামের সাথে احدب — اعرج ইত্যাদি খ্যাত আছে। খোদ রসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবীকে ذو اليدين নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ হাদীসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু পদবী যুক্ত হয়; যেমন مروان الاحضر - سليمان الاعمش - حميد الطويل ইত্যাদি এসব। পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা জায়েয কি না ? তিনি বললেন ঃ দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জায়েয।---(কুরতুবী)

ভাল নামে ডাকা সুন্নত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মু'মিনের হক অপর মু'মিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। এ কারণেই আরবে ডাক নামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন---হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে 'আতীক,' হযরত ওমর (রা)-কে 'ফারুক,' হযরত হামযা (রা)-কে 'আসাদুল্লাহ্' এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে 'সাইফুল্লাহ্' পদবী দান করেছিলেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ
إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

---

(১২) হে মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত

তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্। (তাই ধারণার যত প্রকার আছে, সবগুলোর বিধান জেনে নাও যে, কোন্ ধারণা জায়েয এবং কোন্‌টি নাজায়েয। এরপর জায়েয ধারণার মধ্যেই থাক)। এবং (কারও দোষের) সন্ধান করো না। কেউ যেন কারও গীবত তথা পশ্চাতে নিন্দাও না করে। (এরপর গীবতের নিন্দা করে বলা হয়েছে) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করবে? একে তো তোমরা (অবশ্যই) খারাপ মনে কর (অতএব বুঝে নাও যে, কোন ভ্রাতার গীবতও এরই মত)। আল্লাহ্‌কে ভয় কর (গীবত পরিত্যাগ করে তওবা করে নাও)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতেও পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। এক. ظن তথা ধারণা; দুই. تجسس অর্থাৎ কোন গোপন দোষ সন্ধান করা; এবং তিন. গীবত অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে শুনলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় ظن এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কোরআন প্রথমত বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক; এরপর কারণ-স্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব কোন্ ধারণা পাপ, তা জেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েয না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আলিম ও ফিকহ্‌বিদগণ এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন ঃ ধারণা বলে এ স্থলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ অথবা গোনাহ্ আরোপ করা। ইমাম আবূ বকর জাসসাস 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়েয। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يموتن احدكم الا و هو يحسن الظن بالله তোমাদের কারও আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে انا عند ظن عبدى بى . —অর্থাৎ আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন তার আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। এ থেকে

জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ا يا كم والظن فا ن الظن ا كذ ب الحد يث—অর্থাৎ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।

এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনত জরুরী এবং সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই ; সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব ; যেমন পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্য ফয়সালা দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্য জরুরী। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জায়গায় কিবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেওয়ার মত কোন লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জায়েয ধারণা এমন, যেমন নামাযের রাক'আত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাক'আত পড়া হয়েছে, না চার রাক'আত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ তিন রাক'আত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাক'আত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্য সওয়াবও পাওয়া যায়।—(জাসসাস)

কুরতুবী বলেন ঃ কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَا تُ بِا نْفُسِهِمْ خَيْرًا—এতে মু'মিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাকীদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে ا ن من العزم سوء الظن—অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ আস্থা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে লাঞ্ছিত করবে। মোটকথা, কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে। শেখ সাদী (র)-র নিম্নোক্ত উক্তির অর্থই তাই।

نگہ دار و آں شوخ دریسہ در ۔ کہ دا ند ہمہ خلق را کیسہ بر

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে تجسس ; অর্থাৎ কারও দোষ সন্ধান করা। এই শব্দে দুটি কিরাআত আছে। এক. لا تجسسوا—জীম সহকারে ; এবং দুই لا تحسسوا হ্যাঁ সহকারে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لا تجسسوا و لا تحسسوا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আখফাশ উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে تجسس এর অর্থ কোন গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হ্যাঁ সহকারে تحسس এর অর্থ সাধারণ সন্ধান করা। সূরা ইউসুফে تَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَ أَخِيهِ আয়াতে এই অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোন মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فان من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته و من يتبع الله عورته يفضحه في بيته -

মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন। —(কুরতুবী)

বয়ানুল কোরআনে আছে গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারও কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, تجسس-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হিফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েয। আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্য কথা হয়। কেননা, মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। এখানে 'অনুপস্থিতিতে' কথা থেকে এরূপ বোঝা সঙ্গত নয় যে, উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েয হবে। কেননা, এটা গীবত নয়, কিন্তু لمز তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا—এই আয়াত কোন মুসলমানের বেইজ্জতী ও অপমানকে তার মাংস খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী জীবিত মানুষের মাংস টেনে টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। لمز শব্দের মাধ্যমে কোরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে ; যেমন বলা হয়েছে, لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ এবং আরও পরে এক আয়াত আসবে وَيْلٌ لِّكُلِّ

هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথা-বার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য। মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ করলে যেমন তার কোন কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে, তারও কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মৃত মুসলমানের মাংস খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা, তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোন বীরত্বের কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশংকায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উচ্চতর ব্যক্তির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই।

হযরত মায়মূন (রা) বলেন ঃ একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে--একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম ঃ আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল ঃ কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বলল ঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মূন (রা) নিজে কখনও কারও গীবত করেন নি এবং তাঁর মজলিসে কারও গীবত করতে দেন নি।

হযরত হাসান ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত শবে মি'রাজের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম--এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত।—(মাযহারী)

হযরত আবূ সায়ীদ (রা) ও জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, الغيبة اشد من الزنا অর্থাৎ গীবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ্। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার

পর তওবা করলে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তার গোনাহ্ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাফ নেওয়া জরুরী। কোন কোন আলিম বলেন ঃ যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বান্দার হক হয় না। তাই তার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া জরুরী নয়। --(রূহুল মা'আনী) কিন্তু বয়ানুল কোরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ এমতাবস্থায় যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোনাহ্ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা লাপাত্তা হয়ে যায়, তবে তার কাফ্ফারা এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে ঃ হে আল্লাহ্! আমার ও তার গোনাহ্ মাফ কর। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাই বলেছেন।

মাস'আলা ঃ শিশু, উন্মাদ এবং কাফির যিম্মীর গীবতও হারাম। কেননা, তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারাম। হরবী কাফিরকে পীড়া দেওয়া হারাম না হলেও নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তার গীবতও মাকরূহ।

মাস'আলা ঃ গীবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। উদাহরণত খঞ্জকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার মত হেঁটে দেখানো।

মাস'আলা ঃ কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গীবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণত কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপযোগিতাটি শরীয়তসম্মত হতে হবে। উদাহরণত কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ্ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরূহ। —(বয়ানুল কোরআন, রূহুল-মা'আনী) এসব মাস'আলায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারও দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা না হওয়া চাই ; বরং প্রয়োজনবশতই আলোচনা হওয়া চাই।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝١٣

(১৩) হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহিযগার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব, আমি তোমাদের (সবাই)-কে এক পুরুষ ও এক নারী (অর্থাৎ আদম হাওয়া) থেকে সৃষ্টি করেছি। (তাই এদিক দিয়ে সব মানুষ সমান) এবং (এরপর যে পার্থক্য রেখেছেন যে) তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও (জাতির মধ্যে) বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন, (এটা শুধু এ জন্য) যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। (এতে অনেক উপযোগিতা রয়েছে। এজন্য নয় যে, তোমরা পরস্পরে গর্বিত হবে। কেননা) আল্লাহ্‌র কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহিযগার। (পরহিযগারীর পুরোপুরি অবস্থা কেউ জানে না, বরং এটা একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলা পুরোপুরি জানেন এবং পুরোপুরি খবর রাখেন (অতএব তোমরা কোন বংশমর্যাদা ও জাতিত্ব নিয়ে গর্ব করো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামী অধিকার এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মানুষ অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণ্য মনে না করে এবং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা, এগুলো প্রকৃত-পক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ্ তা'আলা রেখেছেন, তা গর্বের জন্য নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য।

শানে-নুযূল ঃ এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলাল হাবশী (রা)-কে মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। এতে মক্কার অমুসলমান কোরাইশদের একজন বলল ঃ আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কুদিন দেখতে হয়নি। হারেস ইবনে হিশাম বলল ঃ মুহাম্মদ কি মসজিদে-হারামে আযান দেওয়ার জন্য এই কাল কাক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ পেলেন না ? আবূ

সুফিয়ান বলল ঃ আমি কিছুই বলব না ; কারণ, আমার আশংকা হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার (মুহাম্মদের) কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবেন। এসব কথা-বার্তার পর জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের সব কথাবার্তা বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি বলেছিলে ? অগত্যা তাদেরকে স্বীকার করতে হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গর্ব ও ইজ্জতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া, যা তোমাদের মধ্যে নেই এবং হযরত বিলাল (রা)-এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত। ---(মাযহারী) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। (যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে)। তওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন ঃ

الحمد لله الذى اذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها - الناس رجلان بر تقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله ثم تلا يا ايها الناس انا خلقناكم الاية -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত ঃ এক. সৎ, পরহিযগার ও আল্লাহ্র কাছে সম্ভ্রান্ত, দুই. পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহ্র কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে ধন-সম্পদের নাম এবং আল্লাহ্র কাছে ইজ্জত পরহিযগারীর নাম।

شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ—شعوب শুعوب শব্দটি شعب-এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড় পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে شعب এবং ক্ষুদ্রতম অংশ عشيره বলা হয়। আবূ রওয়াফ বলেন ঃ অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে شعب বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قبائل বলা হয়। اسباط শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য পারস্পরিক পরিচয় ঃ কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণত এক নামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্য ব্যবহার কর---গর্বের জন্য নয়।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْ
لَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ
جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الصّٰدِقُوْنَ ﴿١٥﴾ قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّوْنَ
عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ
اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾
اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

(১৪) মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন ঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি ; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (১৬) বলুন ঃ তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (১৭) তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। (১৮) আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।